রবীন্দ্রনাথের গল্পঃ নারী প্রসংগ

সাদ কামালী

বান্দার দাসত্বরীতি বান্দাকে বানিয়েছে দাস

সুয়োরানীর মনে তবুও মরণবিষ, তুষের আগুনে অন্তর পোড়ে, কিছুতেই স্বস্তি মিলে না, দুয়োরানীর তিনমহলার বাড়ি হজম করেও না, দুয়োরানী যে নদীর ধারে চাঁপা গাছের ছায়ায় কুঁড়েঘর তুলে অপরাজিতার রূপ আর শঙ্খচক্রের আলপনায় নিবিড় সুখে আছে ! গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে, মুক্তার ঝিনুকে পদ্মের মালা এবং শঙ্খের গুঁড়ায় সফেদ মেঝের কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলেও সুয়োরানীর মনে সুখ এলো না । দুয়োরানীর মতো কলস কাখে জল তুলেও শান্তি হলো না, শালুক ফুল বনের ফল ক্ষেতের শাক ছেলে তুলে এনে খাওয়ালেও না । সুয়োরানীর মনে মরণকষ্ট । রাজার কাছে অতঃপর তার আব্দার, দুয়োরানীর দুঃখ তার চাই । যে দুঃখের বাঁশিতে বাজবে সুখের সুর । সুয়োরানীতো জানে না পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপর মন নিয়ে সোনার বাঁশিতে ফুঁ দিলেও সুর খেলে না, বরং গলাবিষ করে । নারীকে আধার করে রবীন্দ্রনাথ নীতিগল্প সুয়োরানীর সাধ লিখেছেন বাংলা ১৩২৭ সালে । ইন্তেকালের বছরে লেখা আরও একটি নীতিগল্প রাজরানী । জনৈক রাজা রানী তালাশ করছেন, কোথায় মিলবে রাজার পছন্দমাফিক রানী ! মন্ত্রী, দূত কারও ওপর তার ভরসা নাই । নিজেই যাচাই বাছাই করে নেবেন । রাজা জানে দূত সকল তোষামোদে অভ্যস্ত, বাড়িয়ে বলার প্রবৃত্তি তাদের জন্মগত, তিনি বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ, সেবক, দূর দেখতে পারেন অর্থাৎ দূরদর্শী, প্রজার অভিভাবক, প্রায় ঈশ্বরতুল্য । দরবেশ-সন্ন্যাসীর সঙ সেজে রাজা বের হলেন, প্রথমেই অঙ্গদেশে, সে দেশের রাজকন্যা সন্ন্যাসীর কাছে আব্দার করল চোখ-ভোলানো সাজ যাতে রাজ রাজেশ্বরের দিলে আঁখিতে ধাঁধা লেগে যায় ।সন্ন্যাসী জানতে চায় আর কিছুই চাই না ? রাজকন্যার আর কিছুর দরকার নাই । ছদ্মবেশে রাজা গেলেন বঙ্গদেশে । সন্ন্যাসীর নামডাক শুনে রাজকন্যা সন্ন্যাসীকে দর্শন দিয়ে মনের কথা জাহির করে, তার আব্দার এমন কঠের জন্যে যার মাদকতায় ‘‘কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা--। আমি যা বলাই তাই বলেন ।’’[১]

রাজা গেলেন কলিঙ্গে, রাজকন্যা মন্ত্রণা করছে কী করে কাঞ্চী জয় করে সে দেশের মহিষীর মাথা হেঁট করে তাকে বাঁদি বানিয়ে পায়ে তেলমর্দনের কাজে লাগিয়ে দিবে । সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে রাজকন্যা তাকে ডেকে পাঠায়, তার আব্দার বেশ জোরালো । রাজকন্যা যাকে বিয়ে করবে ‘‘তাঁর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাতজোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিনী হয়ে কেউবা চামর দোলাবে, কেউবা ছত্র ধরে থাকবে ।’’[১] সন্ন্যাসী পথে বেরিয়ে বললেন, ধিক্ । মেকি, স্বার্থপর, হিংস্র, ঈর্ষাতুর নারীর জন্য তার মনে করুণা হলো । মানবীয় নেতি-দুর্বলতা প্রকাশে নারীই বুঝি যোগ্যপাত্র । তবে ওই রাজা চলতে চলতে এক বনে এসে সন্ধান পেয়েছিলেন পর্ণ কুটিরের এক বালিকার, যার হৃদয়ে রয়েছে অকৃত্রিম স্নেহ মমতা, প্রিয়া বা ভগ্নির চিরন্তনী রূপ । অপ্রতুল শাকান্ন আগন্তুকের সাথে ভাগ করে খেতে সে প্রস্তুত ।

বাংলা ছোটগল্প শুধু নয় বিশ্ব সাহিত্যের গল্পের উৎস হিসাবে অনেক পশ্চিমা গবেষকও ‘জাতক’ ‘পঞ্চতন্ত্র’-কে অগ্রে গণনা করে থাকেন । জাতক, পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ ইত্যাদি উত্তমর্ণের কাছ থেকে ইয়োরোপ গ্রহণ করেছে । ম্যাকস মূলার, বেনফি, কেলার ও কীথ প্রমুখ গবেষক এ সম্বন্ধে মোক্ষম সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করেছেন । “১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক থিয়োডোর বেনফি, লীপজিগ থেকে পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করে ইয়োরোপীয় লোকসাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক ব্যাপক আলোচনা আরম্ভ করেন । অবশ্য অনুবাদ ও আলোচনা আরো পূর্বেই সূচিত হয়েছিল অরিয়েন্টালিস্টদের হাতে । That the migration of fables was originally from East to West and not vice versa--."[২]

সে যাইহোক, এ প্রবন্ধে সেই বিস্তার খুব জরুরী নয়, এটুকুর উল্লেখ এজন্যই যে রবীন্দ্রনাথও জাতক পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদির উত্তরাধিকার বহন করেন এবং তিনি যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন । জাতক পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহের

নীতিগল্পসমূহ প্রাণী ও মনুষ্য ভিত্তিক । রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন ওই দু'রকমে । ছোটগল্পের ইতিহাস ও সৌন্দর্যতত্ত্বের ওপর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অসাধারণ গ্রন্থ 'সাহিত্যে ছোটগল্প', উৎসর্গ করেছেন 'গল্পগুরু মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে' । সেই গ্রন্থে নারায়ণ উল্লেখ করেছেন, ''আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেও জাতকের প্রভাব কতখানি তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং । বৌদ্ধ-সাহিত্যের এই মণি-মঞ্জুষা থেকেই তিনি তুলে নিয়েছেন 'কুশ জাতক'-গড়ে উঠেছে 'রাজা' 'অরূপরতন'; 'শ্যামা জাতক' থেকে জন্ম নিয়েছে 'পরিশোধ' 'শ্যামা' ।[৩] এর কয়েক পৃষ্ঠা আগেই নারায়ণ বলছেন, ''নীতিগল্পের সহজ ও সরল গল্পগুলির পাশে সমাজস্থিতির কেন্দ্রবর্তিনী নারীচরিত্র স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে । নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে, জাতকেই হোক আর পঞ্চতন্ত্রেই হোক- এই কাহিনীগুলি নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধক নয় । নারী নিন্দায় পঞ্চতন্ত্রে পঞ্চমুখ হয়েছেন গৃহী বিষ্ণুশর্মা (পঞ্চতন্ত্রের রচনাকার ও সংকলক); সুতরাং বৈরাগ্যব্রতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও যে স্ত্রী-জাতিকে বিষবৎ পরিহার করেন-এ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ।''[৪] প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞতায় পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ শুধু 'জাতকথ বন্ননা' বা 'পঞ্চতন্ত্র'র প্রভাবেই ওই ধরনের নীতিগল্প ফাঁদেননি, তাঁর দার্শনিকতা, সমাজ সংসার সম্পর্কে ধারণা, ভারসাম্য রক্ষার নিজস্ব সমীকরণও ক্রিয়াশীল ছিল । অন্য গল্পের অন্তর প্রদেশ দেখার আগে তাঁর চিন্তামূলক প্রবন্ধের তত্ত্বতালাশ করে নেয়া যাক যেখানে তিনি নারীর শিক্ষা, মন, উচিৎ অনুচিৎ নিয়ে বিস্তর লিখেছেন ।

'লিপিকা' 'গল্পসল্প'র গল্পগুলো লেখার অল্পকিছু আগে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ১৩২২ সালে *স্ত্রীশিক্ষা* বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন । অভিজ্ঞতার বৈভবে আর যুক্তির জালে স্ত্রীশিক্ষার স্বরূপ তিনি সুনির্দিষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন ওই প্রবন্ধে । বর্তমানের অতিআধুনিক বাজারভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা যেমন সব ধরনের কাজকেই বিশেষীকরণ করে ফেলেছে, সময়ের তুলনায় অগ্রসর কবি রবীন্দ্রনাথও চারকুড়ি বছর আগে শিক্ষাকে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন করে নিয়েছিলেন । তিনি বলেন, ''যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে মেয়েকেও জানিতে হইবে । শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই ।''[৫] জানতে চাওয়া মানুষের ধর্ম । ওই লব্ধজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই প্রয়োগ করবে । সমাজে মেয়েদের সেই শিক্ষা প্রয়োগ করার সুযোগ নাই । ''বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব''[৬] নষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা তিনি করছেন না । ওই মেয়েলিভাবটা খুব জরুরী ! মেয়েলিভাব জিনিসটা কেমন ? যা কিছু জানবার তা জানবার অধিকার মেয়েদের দিলেও একথা স্মরণ করে দিতে ভুলেননি, ''তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোন ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয় । মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপর মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে ।''[৬] সমাজে ''মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম । --তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে । বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে । তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এটাই তাদের আদর্শ । --সংসারকে সে ভালোবাসুক আর না বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে--। ভালোবাসার ধর্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরব তাহাতেই । --সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোন অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই ।''[৬] রবীন্দ্রনাথের পশ্চাতে সহস্র সহস্র বছর ধরে আচার বিধানের দড়িতে ফাঁসলাগা আহাজারি ধ্বনিত সংসার সমাজে নারী নিজেকেই নিজে এনে তুলেছে ! সে দায় নারীর ! সেখানে নারী ভালোবাসার দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে ! কবি ফরহাদ মজহারের *এবাদতনামা*'র একটি শ্লোক এখানে বেশ যুৎসই, ''বান্দার দাসত্বরীতি বান্দাকে বানিয়েছে দাস ।''[৭] রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন নারীর সামাজিক অবস্থা নারীর শরীরের মতোই বিধাতার হাতে গড়া । বাইরের কোন অত্যাচার তাকে বাধ্য করায় নি । রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহু আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রামমোহন তাঁর কালের চিন্তা থেকে অনেক দূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন । শাস্ত্রের আগুন থেকে নারীকে বাঁচিয়েছেন, লৈঙ্গিক রাজনীতিতে নারীর পরাভূত কোণঠাসা অবস্থাও তাঁর অজানা নয় । তিনি সেই কালেও মনে করেননি, নারী নিজেই নিজের ভাগ্যের জন্য দায়ী । রামমোহন লিখেছেন, "স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে । ---স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যুন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহাদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে দুই উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগের পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন । পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে ।''[৮] আর রবীন্দ্রনাথের যখন নিতান্ত বালক বয়স, সেই ১৮৭১-এ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীর অধীনতা সম্পর্কে লিখেছেন, ''স্ত্রীজাতি-- সামাজিক

নিয়মদোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন । ---প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরূপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন ।''[৯]

স্ত্রীশিক্ষা লেখার সাত বছর পর লেখা গল্প *পুনরাবৃত্তি*, যুদ্ধের মন্দ খবরে বিমর্ষ রাজা বাগানে বেড়াতে বেরিয়ে দেখেন একটি ছেলে ও মেয়ে রামসীতার বনবাস খেলছে । স্বেচ্ছায় রাক্ষস সেজে তিনি বালক বালিকাকে প্রচুর আনন্দ দেন । খেলা শেষে রাজা তাদের পরিচয় জেনে নিলেন । মেয়েটি রুচিরা, মন্ত্রীর কন্যা । ছেলেটি কৌশিক, পিতা গরিব ব্রাহ্মণ । সময় হলে ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিয়ে হোক রাজা এই ইচ্ছাও প্রকাশ করেন । দেশের নামকরা শিক্ষায়তনের নামকরা অধ্যাপকের কাছে কৌশিককে রাজা পড়াতে পাঠালেন । রাজা কিন্তু একবারও খোঁজ নিলেন না মেয়েটি পড়ে কিনা বা কোথায় পড়ে । রবীন্দ্রনাথের মানসরাজা উদার, বিবেচক, প্রজাবৎসল, তিনিতো পুরুষকে বিশুদ্ধ শিক্ষার জন্য পাঠাবেনই, যদিও রুচিরাও ওই অধ্যাপকের কাছে পড়ে । একই পাঠশালায় রুচিরা কৌশিককে পেয়ে মোটেই খুশি হলো না । বরং লজ্জা-অপমানে সে কুণ্ঠিত । এই অপমানবোধ মেয়েলিভাবের আর একটি দিক, তা হলো, কুল বৈষম্য, শ্রেণী সংস্কার । তা যাই হোক, রাজার আশীর্বাদধন্য কৌশিক যতো না পড়ে তার চেয়ে বেশি খালে বিলে বন-পাথালে ঘুরে বেড়ায় । গান গাওয়া, যন্ত্র বাজানো, সাঁতার কাটায় তার মহাফূর্তি । অধ্যাপক বিদ্যার প্রতি কৌশিকের তত অনুরাগ দেখতে পান না । রুচিরা বরং অনেক পড়ে, অনেক এগিয়ে যাবে । কিন্তু রুচিরাকে নির্মাণের কারিগর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । সময়কালে রাজা যেন নিশ্চিত হয়েই বিদ্যার পরীক্ষায় দু'জনকে বসিয়ে দেন । অযোগ্য কৌশিককে রুচিরার পছন্দ নয় । কৌশিক যোগ্যতা প্রমাণ করবে । পাঠশালার পড়ায় সে খেয়ালি হলেও অধ্যাবসায়ী রুচিরাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলে বিদ্যার দাপটে । রাজা আনন্দিত । আর অধ্যাপক রুচিরার ওপর গোসা করে বলেন, ''কপিল-কণাদের নামে শপথ করে বলছি, আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না ।''[১০] রুচিরা কিন্তু ওই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বিদ্যাশিক্ষায় আরও মনোযোগী হয়ে ওঠে না, বরং পাঠশালার শিক্ষায় অসীম অনীহা । খেলাঘরের সীতা থেকে সংসারের সীতা হয়ে খেলার রাজাকে বরণ করে নিতে পারলেই সে বাঁচে; জৈবিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্যকোন মনুষ্যবোধ তার লুপ্ত !

লিখতে শিখে তারচেয়ে বড়ো কথা গোপনে কাব্য সাধনা করতে যেয়ে বালিকা উমা'র বিপদও কম হয়নি । *খাতা* গল্পের প্রথম বাক্যটি এই, ''লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে ।''[১১] আশা-ভরসা দান দূরে থাক, নতুন লিখতে শিখার উত্তেজনায় যেখানে সেখানে লেখা নিয়ে সংসারে 'বিষম উপদ্রব' উপস্থিত হলো । তবুও উমা লেখে, কপি করে, মনের কথা যত অনায়াসে পারে, প্রকাশ করে । সেই করার জায়গাটি হতে পারে হিসাবের খাতা অথবা দাদার লেখার পৃষ্ঠা । সাত বছরের উমা অতো বোঝে না । লেখার বাতিক দেখে দাদা যদিও একটি বাঁধান খাতা কিনে দিয়েছিলেন । উমা'র আনন্দফূর্তির সীমা নাই । খাতা তার প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী । ধীরে ধীরে ওই খাতার কোন কোন পরিসরে দু'একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে শুরু করল । এর মধ্যেই নয় বছরের উমা'র বিয়ে হয়ে গেল প্যারীমোহনের সাথে । প্যারীমোহন নব্যভাব থেকে দূরে অবস্থান করে পুরাতন ধ্যান ধারণায় প্রবল আস্থা বজায় রেখে কাগজে লিখে থাকে । বালিকা উমা লেখার প্রবৃত্তি নিয়েই শশুরবাড়ি গিয়েছিল, বিয়ে এবং নতুন সংসারে একটু অভ্যস্থ হয়ে আবার সেই বাঁধান খাতায় লিখতে শুরু করে । তবে গোপনে, ঘরের দরজায় খিল দিয়ে । গোপন করার অর্থই হলো অচিরে তা জনগোচরে আসবে । তিলক-কনক-অনঙ্গমঞ্জুরী বৌদির গোপন চর্চা সংসারের হাটে ফাঁস করে দেয় । ফুটোতে চোখ লাগিয়ে তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে অসুবিধা হয়নি । প্যারীমোহন জানতে পেরে বিষম অমঙ্গল বোধে রেগে যায় । স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখে সংসারে যে ভয়াবহ বিপদ আনতে পারে তার এক যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বও সে আবিস্কার করেছিল । প্যারীমাহনের সেই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে জেনে নিই, ''স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়, কিন্তু লেখাপড়ার শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রার্দুভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্ত্বা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয় ।''[১২] রমণী যে বিধবা হয়, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সংসারে ঘটে কত অনাসৃষ্টি সে সব প্যারীমোহন কোন দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখায়নি ।তবে, রবীন্দ্রনাথ ওই তত্ত্ব হয়তো প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে । মেয়েদের মেয়ে হওয়ার জন্য বরাদ্দ শিক্ষা বিমলা পেয়েছিল বাবার বাড়ি থেকে, স্বামী নিখিলেশের কাছ থেকেও । যখন ওই শিক্ষার বাইরে যা একেবারেই পুরুষ-পাঠ্যক্রমের শিক্ষা-রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, স্বদেশবোধ ইত্যাদির শিক্ষায় সে আগ্রহী কৌতূহলী এবং সাহসী হয়ে ওঠে এবং তার অভিঘাত

পড়ে তার আচরণে, তখনই তথাকথিত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাবে সংসারে ঘটে মহা বিপদ । তত্ত্বের প্রমাণ মিলে, বিমলা বিধবা হয় । সে যাই হোক, প্যারীমোহন আপাততঃ উমাকে গালমন্দ করে শাসিয়ে দিল, এ চেষ্টা যেন সে আর না করে । তারপরেও যখন অন্যদিন গোপনে বসে আবার লিখবার চেষ্টা করে তখন সবার সামনে অপদস্থ করে খাতাটি কেড়ে নেয় । উমা'র সাধনার সেখানেই শেষ । রবীন্দ্রনাথ অতঃপর বলেন, ''প্যারীমোহনেরও সূক্ষ্মতত্ত্বকন্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না'' ১৩ সমাজে মানবহিতৈষীর খোঁজ হয়তো সহজে মিলে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথতো ছিলেন ! তিনি কি অন্যকোন উমার হাতে শিক্ষাসাধনার খাতাটি তুলে দিয়েছিলেন ! অথবা প্যারীমোহনের খাতাটি প্রবল দর্পে কেড়ে নিয়েছিলেন ? এই গল্প তিনি লিখেছিলেন বাংলা ১৩০০ থেকে ১৩০১ সালের মধ্যে ।

২৮ শে সেপ্টম্বর ১৯২৪, ষাটোর্ধ রবীন্দ্রনাথ এক বালিকার শুভেচ্ছাচিঠি পান । এই বালিকা কবির শিলঙবাসের ওপর একটি পদ্যময় বর্ণনার জন্য তাড়া দিয়েছিল । এই চিঠিকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ নারী সম্পর্কে তার সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করার প্রয়াস পান । *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি* প্রবন্ধে । কোন এক আশ্চর্য কারণে তিনি মনে করতেন নারী কোন পাথরখন্ডের মতো প্রবাহহীন, গতিহীন স্থিরবস্তু, এর যা নিয়তি তা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, অপরিবর্তনীয় শরীয়তের মতো নারী । প্রকৃতি তাকে নির্মাণের কাজ শেষ করে ফেলেছেন । আর কোন ভাঙ্গা গড়া, দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হবে না, সে স্থিত ও প্রতিষ্ঠিত । আর প্রকৃতি পুরুষকে নিরন্তর গড়ে চলেছেন, পুরুষকে গড়া কখনো শেষ হবে না । পুরুষশক্তি অনবরত জ্ঞান-সাধনার অন্তহীন তৃপ্তিহীন পথে সদাসক্রিয় । ''অজানার মধ্যে কেবলই সে (পুরুষ) পথ খনন করছে, কোন পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না । পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানে নি । পুরুষকে অসম্পূর্ণই থাকতে হবে । --সাহিত্য কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হলো পুরুষের সৃষ্টি ।'' ১৪ আর ''নারীপ্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ । সার্থকতার সন্ধানে তাকে দুর্গম পথে ছুটতে হয় না । জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার (নারীর) মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে । সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোন দ্বিধা নেই ।'' ১৪ ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি আবার লিখেছেন ওই একই ডায়ারিতে, ''আসলে কথা হচ্ছে, প্রকৃতির ব্যবস্থায় মেয়েরা একটা জায়গা পাকা করে পেয়েছে, পুরুষরা তা পায়নি । পুরুষকে চিরদিন জায়গা খুঁজতে হবে । খুঁজতে খুঁজতে সে কত নতুনেরই সন্ধান পাচ্ছে । মেয়েদের জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সার্থকতা হচ্ছে প্রেমে । এই প্রেমে সে স্থিতির বন্ধনরূপ ঘুচিয়ে দেয়; বাইরের অবস্থার সমস্ত শাসনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে । --যে মেয়ের মধ্যে সত্য আছে সে আপন বন্ধনকে স্বীকার করেই প্রেমের দ্বারা তাকে অতিক্রম করে; বন্ধনকে ত্যাগ করার চেয়ে এই মুক্তি বড়ো ।'' ১৫

যখন প্রেম থাকে না, পরস্পরে অবিশ্বাস, একজন আরেকজনকে টেক্কা দিতে চায়, অশান্তিতে সংসার ভরে ওঠে, তখন রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নায়িকা স্বামীর নিন্দা না করে, স্বামীর অসত্য কথার প্রতিবাদ না করে, সুযোগ মতো নিজেই আত্মবিসর্জনের আয়োজন করে নেয় । *শাস্তি* গল্পের 'চন্দরা' বা *ঘাটের কথা*'র 'কুসুম' এর জীবনে সে রকম করুণ পরিণতি ঘটেছিল । শ্রাবণ ১৩০০-তে *শাস্তি* লেখা । দু'ভাই দু'জার সংসারের গল্প লিখতে প্রথম বাক্যেই দু'জা সম্পর্কে লেখেন, ''দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে ।'' ১৬ পাঠক শুরুতেই কলহ-কোলাহল প্রিয় দুই নারীর খবর জানতে পেল । বড় জা রাধা ছোট চন্দরা । চন্দরাই গল্পের কেন্দ্রে । চন্দরার বর্ণনাতে এক জৈবিক নারীর রূপ ধরা পরে, ''মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল; শরীরটি অনতিদীর্ঘ; আটসাঁট; সুস্থ্যসবল অঙ্গপ্রতঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে চলিতে-ফিরিতে-নড়িতে-চড়িতে দেহের কোথাও কিছু বাধে না । একখানি নতুন তৈরি নৌকার মতো ; বেশ ছোট এবং সুডোল ।'' ১৭ চন্দরার স্বামী ছিদামের বর্ণনায় প্রকাশ পায় অন্যরকম তারিফ, ''আর ছিদামকে একখানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহু যত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে । লেশমাত্র বাহুল্য বর্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই । প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ।'' ১৭ বভড়াই দুখিরাম ক্রোধের বশে দায়ের কোপে বউ রাধাকে খুন করে ফেলে । ছিদাম ভাইকে বাঁচাতে উপস্থিত মতো বলে ফেলে তার বউ চন্দরা বড় জাকে খুন করেছে । পাড়া প্রতিবেশী, থানা -পুলিশ বিশ্বাস করে নেয় । এই ঘটনা ঘটার আগে চন্দরার প্রতি অবিশ্বাসে ছিদাম মনে মনে তার মৃত্যু কামনা করেছিল । অবচেতনায় সুপ্ত ইচ্ছার প্রভাবেই কি ছিদাম নিজের বউকে মিথ্যা দোষী করে ! কিন্তু চন্দরা এই মিথ্যা অভিযোগ অস্বীকার করে না । ফাঁসির হুমকিতেও

না । চন্দরার সাথে ব্যবহার এবং অন্য নারীর প্রতি আসক্তি সন্দেহে ছিদামকেও সে খুব সহ্য করতে পারছিল না । যদিও গোপনে ছিদামের মতো স্বামীর মৃত্যু কামনা করে নি। প্রেম ও ভালোবাসার জন্য জীব প্রকৃতির তৈরি নারী কী করে সেই অসম্ভব কামনা করতে পারে ! স্বামীর মিথ্যা ভাষণকে জনসম্মুখে তুলে ধরার চেয়ে ওই অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নেওয়াই শ্রেয় । তাতেই জগতের সবাই ধন্য ধন্য করবে । সতের আঠার বছরের সুস্থ সবল এক জোয়ান নারী ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়লে ত্যাগের মহান আদর্শ প্রমাণ করার সুযোগ মিলবে বৈকি ! এমন কি হতে পারত, সত্যের খাতিরে না হলেও মৃত্যুর ভয়ে চন্দরা প্রকৃত ঘটনা পুলিশ-আদালতকে জানিয়ে জীবনের ''ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয় ।'' ১৮ লেখকের দায় কি শুধু বাস্তবতার দাসত্ব করা ! যা ঘটে, যা ঘটে আসছে, সংস্কার যার অনুমোদন করে, লেখক শিল্পী সে সবের নকল না করে তার স্বপ্ন, প্রত্যাশা, বোধকে প্রকাশ করে অচলায়তনকে ধাক্কা দিবেন এইতো স্বাভাবিক ।

ঘাটের কথা'র কুসুম পত্রযোগে জানতে পেরেছিল তার বৈধব্যের খবর । বিদেশে চাকরিরত স্বামী, চাটুজ্জেদের বাড়ির ছোটবাবু যে মরেছে, সেই খবরে সন্দেহহীন হয়ে কুসুম বিধবার সাজে আবার বাবার বাড়ি চলে আসে, বাবার বাড়ির সেই বাঁধান ঘাটেও চলে যাওয়া-আসা, কিন্তু এবার তার পায়ে মলের সুর তরঙ্গের বদলে বড়ো বিষণ্ন সুর । একদিন হঠাৎ, পূর্ণিমাতিথীতে দেখে ফেলে সম্প্রতি আসা খুব আলোচিত সন্ন্যাসীকে । কুসুমের আগে যারা তাঁকে দেখেছে, দেখে চেনা মনে হয়েছে তাদের একজন মন্তব্য করল, ''ওলো এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী !'' ১৯ অন্যজন সন্ন্যাসীর প্রতি কোনরকম মনোযোগ না দিয়েই বলল, ''আহা সেকি আর আছে । সেকি আর আসবে । কুসুমের কি তেমন কপাল !'' ১৯ গ্রামের ওই মহিলাগণ রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী ঠিকই বুঝেছিল, কুসুমের তেমন কপাল নয়, কুসুমদের তেমন কপাল হতে নাই । কুসুমও যেদিন জ্যোৎস্নামুখে নিয়ে সন্ন্যাসীকে দেখে, দেখে আত্মায় কাঁপ উঠলেও প্রণাম করে সেদিনের মতো চলে যায় । পরদিন থেকে সে আসতে শুরু করে মন্দিরের কাজে, সন্ন্যাসীর খেদমতে । সন্ন্যাসী কি কুসুমকে চিনতে পেরেছিল ? প্রথম দেখার পর সে কিন্তু সেই সন্ধ্যায় ওই ঘাটে অনেকক্ষণ বসেছিল । কে জানে, দশ বছর আগে দেখা আট বছরের বালিকার রূপ আর কতটাই স্মৃতিতে টিকে থাকে । কুসুমের হয়তো ভুল হয়নি । সন্ন্যাসীর শাস্ত্রবয়ান শুনতে শুনতে এবং মন্দিরের দেখভাল করতে করতে এক রকম জৈবিক অনুভূতি তাকে দিশেহারা করে দেয় । সে আর যায় না । একদা কিশোরহৃদয় যে স্বামীদেবতার পায়ে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল, সেই দেবতা যখন নাগালের মধ্যে তখন তো তরুণ কুসুম বিহ্বল হবেই । সে তাকে স্বপ্নে ও জাগরণের মধ্যে দেখতে থাকে । এই দেখা ঠিক কিনা তা বুঝতে না পেরেই কুসুম সন্ন্যাসী ও মন্দির দর্শনে যেতে গাফিলতি করছিল । সন্ন্যাসীর ডাকে এবং নির্দেশে যখন সে বাধ্য হলো মন্দিরে আসতে এবং তার সঙ্কটের কথা প্রকাশ করে দিতে, তখন, সন্ন্যাসী তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিতে কালক্ষেপ করে না, বলল, ''আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে ।''২০ সমাজে নারী তো স্থিত, প্রতিষ্ঠিত, তার নিয়তি নির্ধারিত । সে ভালোবাসবে, এই একটি কষ্টিপাথরেই তাকে যাচাই করা হবে । কুসুমের অবাধ্য হৃদয় যুবক সুদর্শন স্বামীকে ভুলে থাকবার নির্দেশ কড়ায় গন্ডায় মানতে পারবে না, আবার অধিকার নিয়ে এমন কি ধর্ম নিয়ে, স্বামীর মিথ্যাচারের (মরার সংবাদ দেয়া) বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না, অনুমতিও দিবে না কেউ কারণ আদর্শ নারীর সেটা শোভা পায় না । সেই ঘাটের একটি একটি সিঁড়ি অতিক্রম করে আবাল্য যে জলের সাথে খেলা করত সেই উদ্ধারহীন জলের স্রোতে তলিয়ে যেয়ে সব সঙ্কট নিভিয়ে কাঙ্ক্ষিত নারীর দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল করে তুলতে পারল ! মাত্র আট বছর বয়সে কুসুম নিজ গ্রামে ফিরে এসেছিল বিধবার বেশে । তারপর দশ বছর বাদে এই সন্ন্যাসীর আগমন এবং কুসুমের সলিল-সমাধি । এই অতি কিশোরবিধবার জীবন মৃত্যুতে ঠেলে দেয়ার আগে সমাজে বিধবা বিবাহের তোড়জোর, অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা কিছুই রবীন্দ্রনাথকে আলোড়িত করেনি ! বিদ্যাসাগরের হিন্দু বিধবা বিবাহের নানা কসরৎ অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল । তবে তা সাগরের আকাঙ্ক্ষিত পথে নাও হতে পারে । গোঁড়া হিন্দু, সংস্কারপন্থী অনেকেই বিধবার পতিগ্রহণ সুনজরে দেখে নি । ঠাট্টা মশকারাসহ বিদ্যাসাগরের জীবনের ওপরও হুমকিও এসেছিল । এক অকাল বিধবাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথও গল্প লিখেছেন, সমাজের আলোড়ন তাঁকে স্পর্শ করেছে বৈকি । তবে তা কিভাবে সেটা ভিন্ন বিষয় । বিধবার ব্রহ্মচর্যপালন রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ নয় । আর বিদ্যাসাগর ১৮৮৫তেই চেয়েছেন বিধবাকে পূজার ঘর থেকে রেব করে রক্তমাংসের নারীর স্বীকৃতি দিতে । তিনি লিখেছেন, ''দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা, যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, উহা, বোধ করি, চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন । অতএব,

হে পাঠক মহাশয়বর্গ ! আপনারা অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্বক, বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করা এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত--!''[২১] বেগম রোকেয়া বলেছেন, ''আশরাফগণ সপ্তম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে চির-বিধবা রাখিয়া গৌরব বোধ করেন।''[২২] *প্রতিবেশিনী* গল্পে বাল্যবিধবার প্রতি এক অব্যাখ্যাত কারণে গল্পের কথক দুর্বলতা অনুভব করে। সে জানে না এই আকর্ষণ কতটা জৈবিক, কতটা সামাজিক, অর্থাৎ সংক্রমিত। তার বন্ধু নবীনমাধব তখনো কিছু জানত না। কথক ওই বিধবাকে রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রভাবে বাসর ঘরের ফুলশয্যার চেয়ে ''দেবপূজার জন্যই উৎসর্গ করা''[২৮] মনে ভাবত। কথকের হৃদয়ে তবুও আবেগের জোয়ার, বাধাহীন সেই আবেগ জনসমক্ষে প্রকাশ করা অনুচিৎ। ঠিক তখন বন্ধু নবীনমাধবের হৃদয়েও কাব্যজোয়ার বাধাহীন হয়ে ওঠে। কোথায় এই কাব্যের উৎস সে সম্পর্কে সে খুব সতর্ক। কথক নবীন মাধবকে আশ্রয় করে নিজের আবেগ প্রকাশ করতে পারে। কথকের প্রত্যক্ষ পন্ডিতিতে নবীনমাধবও মনের ভাব লিখতে পারে, এবং যার জন্য এই উতলাভাব তাকেও তার ভাইয়ের দূতিয়ালিতে পাঠাতে পারল। তাতে কাজও হয়। দুই যুবা কোন এক বাল্যবিধবা প্রতিবেশীকে নিয়ে এই ভাবাবেগ-রোমান্টিকতায় মেতে ওঠে। যেন বিধবা মাত্রই এমন আকর্ষণের বিষয়, যখন সমাজে আইন হয়েছে, বিধবা বিবাহে বিপত্তি নাই। গল্পের শেষে, কথক জানতে পারে যার প্রণয়ে এমন আবেগ-কাতর তার বন্ধু নবীনমাধবও হৃদয়ের বার্তা পদ্যাকারে তাকেই পাঠাতে ব্যাকুল। নবীন মাধব তাতে সফলও হয়। বিধবা সবার সম্মতিক্রমে নবীনমাধবকে বিবাহ করতে সম্মত। কথক এই তথ্য অবগত হয়ে যারপরনাই বিস্মিত। সীমিত পরিসরে বিধবাকে নিয়ে এই কৌতুক-নক্সা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন গল্পের আঙ্গিকে।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি*--তে লিখেছেন পুরুষ সম্পর্কে কিছু দ্বিধা, তারাও কখনো মন্দ আচরণ করে থাকতে পারে, ''পুরুষ কখনো কখনো এমন এমন কান্ড করে যেন নারীর মধ্যে অনিবর্চনীয়তার কোন আভাস নেই, যেন তার মাটির প্রদীপে কোন আলোই জ্বলেনি--। ফেউ সাক্ষ্য দেয় বাঘেরই অস্তিত্বের।''[২৪] তারপর তিনি নারী সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাহীন চিন্তা প্রকাশ করেন। ''সেই একই কারণে মেয়ে সংসারস্থিতির লক্ষ্মী, আবার সংসার ছারখার করবার প্রলয়ংকরীও তার মতো কেউ নেই।''[২৪] 'সংসার ছারখার করবার প্রলয়ংকরী' নারীর গল্প রবীন্দ্রনাথ ফেঁদেছিলেন ওই ডায়ারি লিখবার আগে বাংলা ১৩০৫ সালে। কুচবিহারের মহারানী ভূতের গল্প বড়ো ভালবাসতেন, তার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ *মণিহারা* গল্পটি বলেন। ভূতের গল্প বলতে যেয়েও তিনি একটি মেয়েভূতের গল্পই শুধু বলেন না, বলেন, গয়নালোভী এক নারী যে সংসার ও বাণিজ্য ধ্বংস করে কিভাবে স্বামীর জীবনেরও সর্বনাশ করে তার গল্প। রানীকে একটু আনন্দ দেয়ার জন্য অথবা আস্থা বাড়াবার জন্য মূল গল্পটি যে কেউ নয় স্কুলমাস্টারের বয়ানে তিনি শোনান। অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া স্কুলমাস্টার আবেগ মিশিয়ে দাম্পত্যনীতি, স্ত্রী, পুরুষ সম্পর্কে অনেক মতামত দিতে কার্পণ্য করেন না। নায়িকা মণিমালিকা, স্কুলমাস্টার তাকে এভাবে পরিচয় করান, ''একে কালেজে পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন কি, ব্যামো হইলে আসিস্টান্ট সার্জনকে ডাকা হইত।''[২৫] মাস্টারের মতে, ''স্ত্রীজাতি কাঁচা আম ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে।''[২৫] তা যাইহোক, নায়ক ফণিভূষণ সফল ব্যবসায়ি, স্ত্রীকে ভালোবাসেন, কিন্তু মোটেও কড়া স্বামী নয়। মণিমালিকা সোহাগ ও অলংকার কোনরকম আব্দারের আগেই পেত। যখন কোন কারণে ফণিভূষণের কারবারে ভীষণ ফাঁড়া উপস্থিত, নগদ একথোক টাকা অচিরেই দরকার, তখন সে ঋণ-মহাজনের কাছে বদনামের ভয়ে টাকা না চেয়ে মণিমালিকার গয়না কিছুদিনের জন্য বন্ধক রেখে নগদ সমস্যা মিটাতে চেয়েছিল। কিন্তু সম্মতি মিলল না বরং মণিমালিকা, ফণিভূষণের আড়ালে গ্রামের দূরসম্পর্কের আত্মীয় মধুকে ডেকে পাঠায় পরামর্শের জন্য। মধু মণিমালিকার আশঙ্কারই প্রতিধ্বনি করে। ফণিভূষণ ব্যবসায়ের কাজে অন্যত্র আর মণিমালিকা সারারাত ধরে সব গয়না গায়ে জড়িয়ে, চাদর দিয়ে, শরীর ঢেকে মধুর আনা নৌকায় চড়ে বসল, গয়না সব নিরাপদ আশ্রয়ে বাপের বাড়ি রেখে আসবে। গয়নাপ্রীতি একটি মেয়েলি স্বভাবেরই অংশ, মেয়েদের মেয়ে হবার শিক্ষার জন্যও জরুরী, আর এই প্রীতির নেপথ্যে রয়েছে গয়নার সরবরাহকারী ফণিভূষণ বা রাম-রহিম। তাদের দৃষ্টিতে আরও রমণীয়, আরও কামাতুর দেখাতে এতো গয়নার গড়াগড়ি। এক সময় নারীও আপন অধিকারের, একান্ত কাম্যসামগ্রী বিবেচনা করতে থাকে। গয়না হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক স্মারক। গয়নার প্রতি নিঃসঙ্গ সন্তানহীন সুন্দরী মণিমালিকার লোভও দুর্নিবার, অন্তত রবীন্দ্রনাথ তাকে সে ভাবেই তুলে ধরেছেন। ''মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গয়নাগুলিও আছন্ন ছিল।''[২৬] অতিলোভের ফল

শুভ নয় । এই আপ্তবাক্য এখানে খাটে । মধুও লোভমুক্ত সন্ন্যাসী নয় । বহুমূল্যের গয়না সেই বা হাতছাড়া করবে কেন । মণিমালিকা নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারল না । বাক্সভর্তি গয়না কেড়ে নিতে হয়তো খুন না করলেও চলত । কিন্তু শরীরের অঙ্গে অঙ্গে গাঁথা গয়নাতো শরীর বধ না করে লওয়া সম্ভব নয় ! ফণিভূষণ যখন মণিমালিকা বা মধুর কারও খবরই পেল না, শোক ও আঘাতে বিমর্ষ, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকারে, রাতে মণিমালিকার কণ্ঠস্বর, গয়নার ঝমঝম, শুনতে এবং তার ছায়াও দেখতে শুরু করল । ''ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল,--কঙ্কালের আট আঙ্গুলে আংটি করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা,--অলংকারগুলি ঢিলা, ঢল ঢল করিতেছে,--সর্বপেক্ষা ভয়ংকর তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালো তারা সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা --।''[২৭] আঠার বছর আগে মণিমালিকাকে ফণিভূষণ নহবতের সাহানা-আলাপে যেমন প্রথম দেখেছিল, এই ভূত মণিমালিকার অস্থির ভিতরও সেই চোখ সে দেখতে পায় এবং তার 'অঙ্গুলিসংকেতে' ধীরে ধীরে নদীর সর্বনাশা স্রোতে মুখ থুবড়ে পড়ে ।

সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় বক্তব্যের গল্প *সংস্কার* (১৩৩৫), শেষ বয়সে লেখা এই গল্পেও সংগতিহীনভাবে রবীন্দ্রনাথ গয়নাপ্রীতির খোঁচা দেন । কলিকা এবং গল্পের কথক তার স্বামী স্বদেশী ভাব, খদ্দর ইত্যাদি নিয়ে তর্ক করছিল । কলিকার গলায় ছিল উত্তেজনা । সেই গলা দাসী শুনে ভাবল ''ভার্যাকে পুরো ওজনের গয়না দিতে ভর্তা বুঝি ফাঁকি দিয়েছে''[২৮] গয়না ছাড়া মেয়ের দল কী বিষয় নিয়েইবা ঝগড়া করবে ! যখন মেয়েরা যুক্তি দিয়ে, বিবেচনা দিয়ে, নিজের মতামত প্রকাশ করতে প্রয়াস পায় তখনই হয়তো শুনতে পাবে, এ সব কোন পুরুষ পন্ডিতের কথা, কোন রকম শুনেই তা উগরে দিচ্ছে । কলিকা স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গে খদ্দর পরা নিয়ে কথা বলছিল । তখন তার স্বামী বলল, ''আচারজীর্ণ দেশে খদ্দর-পরাটা সেই রকম মালা তিলকধারী ধার্মিকতার মতোই একটা সংস্কারে পরিণত হতে চলেছে বলেই মেয়েদের ওতে এত আনন্দ ।''[২৮] কলিকা পাল্টা যুক্তি দেয়, ''দেখো খদ্দর-পরার শুচিতা যেদিন গঙ্গাস্নানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাঁধা পড়ে যাবে সেদিন দেশ বাঁচবে । বিচার যখন স্বভাবের সঙ্গে এক হয়ে যায় তখনই সেটা হয় আচার, চিন্তা যখন আকারে দৃঢ়বদ্ধ হয় তখনি সেটা হয় সংস্কার --।"[২৮] তখন স্বয়ং গল্পকার রবীন্দ্রনাথ পাঠককে দ্রুত জানিয়ে দেন, ''এই কথাগুলো অধ্যাপক নয়ন মোহনের আপ্তবাক্য ।''[২৮] কলিকার পক্ষে বুদ্ধির কথা বলা সম্ভব নয় । শুধু তাই নয়, খদ্দর-পরাটা কথক মনে করছে অন্য অন্য ধর্মাচারেরর মতোই সংস্কার এবং সংস্কার বলেই মেয়েদের আনন্দের বিষয়, দেশপ্রেম বা রাজনৈতিক চেতনার বিষয় নয় । তবে এই মনে করাটাকে আরও প্রামাণ্য করার জন্য নতুন একটি ঘটনার অবতারণা করে কলিকার সংস্কারান্ধচরিত্রকে নিশ্চিত করে দেয় ।

কলিকা ও তার স্বামী দাওয়াতে বন্ধুবাড়ি যাওয়ার পথে মটর ভিড়ে আটকে যায়, ঘটনা এরকম, এক সরকারি মেথর গোসল সেরে ধোয়া কাপড় পড়ে হলেও যেতে যেতে কারও গায়ে ছোঁয়া দিয়ে ফেলেছে । এই অপরাধে মাড়োয়ারি ব্যবসায়িরা মারমার করে মেথরকে পিটাতে শুরু করে । কলিকার স্বামী এই অনাচারে খুবই মর্মাহত হয়ে মেথরকে তার মটরে তুলে নিতে চায় । তখন কলিকা স্বামীর হাত চেপে ধরে, ''করছ কী ! ও যে মেথর ।''[২৯] কলিকা দেখতে পায় মেথরটারই দোষ, ও কেন রাস্তার মধ্য দিয়ে যাবে । ওর মতো একটা দলিত পাপীর ছোয়াঁয় অন্যদেরতো মেজাজ খারাপ হবেই । জাতপাতের মতো ব্যাপ্ত সংস্কারের কালিতে কলিকাকেও কালিমালিপ্ত করা খুব জরুরী ছিল !

পাত্র পাত্রী গল্পের (১৩২৪) পাত্র সনৎকুমারের ষোল বছর বয়সে আচার সংস্কারনিষ্ঠ মা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পন্ডিতের শিশুমেয়ের সঙ্গে সনতের বিয়ের সম্বন্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, ''কারণ, সে শিশুও বটে, সুশীলাও বটে, আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে অঙ্কে অঙ্কে মিল । তা ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যাদায়মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী ।''[৩০] কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা সেই বিয়ে ভন্ডুল করে দেয় । সনৎকুমার এম এ পাশ করে যখন পাত্র হয়ে উঠল, তখন ডেপুটি তার যোগ্য বিত্তশালী ব্রাহ্মণ কন্ট্রাকটরের মেয়েকে পাত্রের অমতেই ঠিক করে ফেলে । মেয়েটির মা সম্পর্কে গল্পের কথক সনৎকুমার বলছে, ''তার মা পাথুরে কয়লা পর্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাঁধেন; তার অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎসরা মুসলমান বংশীয় নয় এবং জলে পেয়াঁজ উৎপন্ন হয় না । তাঁর মেয়েটিকেও তিনি স্বহস্তে সর্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন--সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেছে ।''[৩১] পাত্র সনৎকুমারের স্বাধীন মত প্রকাশের কারণে এই বিয়েও হয় না । সনৎকুমারের মা ব্রত পালন, পূজা আহ্নিক, ব্রাহ্মণের ভোজন

দক্ষিণা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, আর ব্রাহ্মণ কন্ট্রাকটরের স্ত্রী, তার মেয়ের সংস্কারের নমুনাও দেখা হলো, শুধু ডেপুটি এবং কন্ট্রাকটরের সংস্কার নিয়ে তেমন জানতে পারিনি, তবে পাত্র সনৎকুমার যখন আরও সাবালক হয়ে নিজেই সফল ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে সমাজের উঁচু তলার মেয়েদের সাথে ওঠবস করার মওকা পেল, তখন মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা অর্থাৎ গল্পের কথকের অভিজ্ঞতা শোনা যেতে পারে । বিশেষ করে তার এই অভিজ্ঞতা আরও জোরাল, এজন্য যে, সে তখনো পাত্র, পাত্রী সন্ধান এবং সে সম্পর্কে কৌতূহলও বেশ স্পষ্ট । আচারসর্বস্ব নারীদের সাথে শহরের সাহেবী কায়দা কানুন অভ্যস্ত নারীদের তুলনা করছে, ''সেই যে আমার ব্রতচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদব কায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, অনায়াসে অক্লান্ত চিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে । তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখালে অশ্রদ্ধায় কুণ্ঠিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি অ্যাকসেন্টের একটু খুঁত কিংবা কাঁটা চামচের অল্প বিপর্যয় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে । তারা দিশি পুতুল, এরা বিলিতি পুতুল ।''[৩২] গল্পের চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর যত নেতি, যত তার কুস্বভাব, হীনমণ্যতা সবই সাধু ভাষার আর্কষণীয় বর্ণনায় প্রকাশ করেও যেন বলা শেষ হয় না, বলতে বলতে সনৎ বাবু (অথবা রবীন্দ্রনাথ) কিছুটা দিশেহারা, বলছে, ''একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে । কিন্তু, মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে । সেই জীবাণুর পরিবর্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষ মানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়াছেন ।''[৩২] রবীন্দ্রনাথের পুরুষচরিত্র শেষ পর্যন্ত নারী প্রজাতিকে মানুষ হিসাবে মানতে নারাজ । গল্পের পুরুষেরা রাজা, জগতের সকল শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত, তারা আমলা, কন্ট্রাকটর, গবেষক, ব্যবসায়ী, পুরোহিত, এবং সংসারের নৈতিক ও অর্থব্যবস্থার অভিভাবক । সমাজে জ্ঞানীগুণী মহৎপ্রাণদের ঘিরে বহু গবেষক-স্নব জন্ম নেয়, সেসব স্নব মহৎপ্রাণকে এমন অসীমে নিয়ে যায় যেখানে তাঁদের আর মানব সন্তান মনে হয় না, মনে হয় অতিমানব । তাদের মানবিক এবং স্থান-কালের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতাকে বোঝার ক্ষমতা লুপ্ত হয় । অথচ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় মহৎপ্রাণ ও সাধারণ পাঠকের মধ্যে এক ধরনের সত্যসম্পর্ক তৈরি হওয়ার সুযোগ হয়, মায়ায় বিভ্রান্ত হতে হয় না । ভাষা, শিল্প, সাহিত্য শুধু নয়, বাঙালির শিল্প-আত্মা তৈরিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা জনকের মতো । তবুও কি জনকের প্রতি মোহমুক্ত খোলা চোখে তাকাতে পারব না ! স্থান কাল পরিবেশের বিবেচনা থেকেও !

আজকের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে, চিন্তা ও দর্শনের নতুন নতুন দিক উন্মোচনে তাঁর কোন কোন ধারণা বিশ্লেষণতো সমালোচিত হতেই পারে । এখনতো মনে করা সম্ভব নয়, জীবপ্রকৃতি চূড়ান্তভাবে নারীকে স্থিত ও প্রতিষ্ঠ করে দিয়েছে বা বিনা তর্কে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপ্রণালী বা যাচাই করার একটিমাত্র কষ্ঠি পাথরকে সত্য বলে গ্রহণ করে নিব, যেহেতু তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ! এই প্রবন্ধের অধিকার শুধু গল্পে নারীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দৃষ্টিপাত করা, এবং প্রবন্ধের সমর্থনে নারী বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামতকে উদ্বৃত্ত করা মাত্র । বিষয়ান্তরে যাওয়ার সুযোগ নাই অতএব আরও কিছু গল্প ও মতের খোঁজে যাওয়া যাক ।

মাংসের চেতনা থেকে বয়স্ক বুদ্ধিতে বেড়ে ওঠা নারীর খোঁজে

বাংলা ১৩৪৩ এ নিখিলবঙ্গ-মহিলা কর্মীসম্মিলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ *নারী* নিবন্ধটি লেখেন এবং ওই সম্মিলনে পাঠ করেন । ওই কর্মীসম্মিলনেও তিনি *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি*, *স্ত্রীশিক্ষা* ইত্যাদি প্রবন্ধে যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করেন নিবন্ধের অর্ধেক জুড়ে, ''প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে নারীর হৃদয়ে । --এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয় বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্ত ভাবে । --গৃহে নারী যেমনি প্রবেশ করেছে কোথা থেকে অবতীর্ণ হল গৃহিণী, শিশু যেমনি কোলে এল মা তখনই প্রস্তুত । --পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল থেকে এই রকম ভাঙ্গা গড়া চলছে । ইতিমধ্যে, নারীর মধ্যে প্রেয়সী, নারীর মধ্যে জননী প্রকৃতির দৌত্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ করে চলেছে ।--প্রকৃতি তাকে যে হৃদয় সম্পদ দিয়েছেন নিত্য কৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পরখ করতে দেওয়া হয়নি । নারী পুরাতনী ।''[৩৩]

তবুও নারী রবীন্দ্রনাথের কল্পপ্রকৃতির বরাদ্দ ভূমিকায় বসে নাই, উঁচু তলায় বসে শুধু জাতের নারীদের হৃদয়ের আবেগ আর আচারের অন্ধতায় বন্দী দেখা যায়, এবং বংশীয় কোন নারী পালকির দরজা খুলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সাহস

দেখলে উঁচু তলা থেকে মনে হয়, এই বুঝি গেল । যে ভাষার তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পী সেই ভাষাভাষির শতকরা আশিভাগ জনতার অর্ধেক নারী নিজের ও সংসারের অন্য সদস্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে । হৃদয়বৃত্তির সঙ্কটে 'কুসুম' 'চন্দরা' শুধু আত্মাহুতি দেয় না, তাদের মতো গ্রামবাংলার সহস্র নারী সংসারের ভার বহন করে আসছে । তিনি যেমন কর্মোদ্দীপনায় উৎসাহী বর্মী নারীদের দেখেছিলেন, বাংলার নারীদের সেই উদ্দীপনা দেখার সুযোগ তাঁর কম হয়েছিল, তিনি স্বীকার করেছেন, নারী নিবন্ধেই, ''বহুদিনের যে-সব সংস্কারজড়িমাজালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কেটে যায় নি, তবুও তার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে, কতখানি যে, তা আমাদের মতো প্রাচীন বয়স যাদের তারাই জানে । আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে ।"[৩৪] নারী সম্মিলনে তিনি যেমন পড়লেন, ''এই যে মুক্ত সংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়েছে, এতে করে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্য তাদের বিশেষ করে বুদ্ধির চর্চা বিদ্যার চর্চা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল-- ।"[৩৪] একি সম্মিলনের মেজাজ-অনুকুল নিবন্ধ পাঠ না তাঁর শেষ বয়সের উপলব্ধি ! যদিও তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কোন প্রবন্ধ আর লেখেন নি, তবে সংস্কার (১৩৩৫) রাজরানী (১৯৪১) ইত্যাদির মতো গল্প লিখেছেন ।

১৯৪০-এ লিখেছেন বড় গল্প *ল্যাবরেটরি,* সংলাপে ঠাসা, এর আঙ্গিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ থেকেই উদ্বৃত্ত করা যাক, ''সাহিত্যে বড়ো গল্প বলে যেসব প্রগলভ বাণীবাহন দেখা যায় তারা প্রাকভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণীদের মতো - তাদের প্রাণের পরিমাণ যত দেহের পরিমাণ তার চারগুণ, তাদের লেজটা কলেবরের অত্যুক্তি ।"[৩৫] যাইহোক, *ল্যাবরেটরি* র সোহিনী বা তার মেয়ে নীলিমার মধ্যে সম্ভাবনা ছিল জীবপ্রকৃতির প্রাকৃতিক মেয়ের বদলে মুক্তবুদ্ধিচর্চায় বিকাশমান চরিত্র সৃষ্টি হবার, শেষ পর্যন্ত তা হলো না । সোহিনীর স্বামী নন্দকিশোর বৃটিশের বৈষম্যের কারণে উপযুক্ত পদ পায় নি, সেই আফসোস তার ছিল বলে পুষিয়ে নিত কিছু নিয়মবর্হিভূত আয়ে, তার চাকরিও চলে যায় একদিন । স্বাধীন ব্যবসার উদ্দেশ্যে পুরাতন লোহালক্কড়ের ব্যবসা শুরু করে । এর সাথে চলে সখের বৈজ্ঞানিক গবেষণা । সেই গবেষণায় ছিল ষোলআনা মনোযোগ । স্ত্রীকেও পড়া লেখা শিখিয়েছে । কতদূর কী পড়েছে তার কোন হদিস ওই দীর্ঘ গল্পে নাই । নন্দকিশোর মারা যাওয়ার পর সোহিনী সব ব্যবসা গুটিয়ে দিয়ে চিন্তিত হলো ল্যাবরেটরি নিয়ে । স্বামীর একান্ত ভালোবাসা সাধনার ল্যাবরেটরিতে গবেষণাকাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারল না, বিজ্ঞান শিক্ষা তার নাই । সে দু'বেলা ধূপ ধুনো দিয়ে পূজা করে, আর খোঁজ করছে কোন তরুণ বিদ্যার্থী গবেষকের । তার মেয়ে নিলীমা কিন্তু বেশ বড়, তাকেও যোগ্য পাত্রে পাত্রস্থ করতে হবে । বিত্তবান সোহিনী নীলিমাকে বিজ্ঞান শিখাতে ব্যস্ত হচ্ছে না । তরুণ রেবতী ভট্টাচার্যের প্রতি তার দৃষ্টি পড়েছিল । মেধাবী, ''এরই মধ্যে সায়েন্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে ।''[৩৬] সোহিনী চায়, বেরতী ল্যাবরেটরির দায়ভার বুঝে নিক । এই চাওয়ার মধ্যে সেই মেয়েলি বুদ্ধি, সোহিনী নিজেই বলছে, ''মেয়েলি বুদ্ধি বিধাতার আদি সৃষ্টি, যখন বয়স অল্প থাকে মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপে ঝোপে, যেই রক্ত আসে ঠান্ডা হয়ে বেরিয়ে আসে সনাতনী পিসীমা ।''[৩৭] প্রিয়া আর জননীর বাইরে নারীর অন্যকোন রূপ নাই । রেবতীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সোহিনী, সঙ্গে নীলিমা । মাতৃতুল্য সোহিনী রেবতীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, শত হলেও সে ছত্রির মেয়ে আর রেবতী ব্রাহ্মণের ছেলে । ল্যাবরেটরিতে তাকে নিমন্ত্রণ জানাতে এলেও নীলিমাকে সাজিয়ে এনেছে খুব রমণীয় সাজে । তরুণ রেবতীকে তার চাই, মেয়ের জন্য ল্যাবরেটরির জন্য । নীলিমাকে ''পড়িয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসি শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বাসন্তী রঙের কাঁচুলি ।''[৩৮] জৈবিক নারী আর সংস্কার ভিন্ন সোহিনী নীলিমার ভিতর থেকে আর কোন আলোর ছটা অন্ধকার পথে এসে পড়ে ? সোহিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ''সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায় কালোয় মিশানো খাঁটি রিয়ালিজম, অথচ তলায় তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজমই হলো সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ ।''[৩৯]

নারী নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, ''প্রকৃতির কাছ থেকে তারা (নারী) পেয়েছে অশিক্ষিত পটুত্ব, মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাদের সহজে লাভ করা । যে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রসটি না থাকে, কোন শিক্ষায় কোন কৃত্রিম উপায়ে সংসার ক্ষেত্রে সে সার্থকতা পায় না ।''[৩৩] অসার্থকদের অর্থাৎ অশিক্ষিত পটুত্বহীনদের অবস্থা হয় মৃণালের মতো । সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয় । *স্ত্রীর পত্র* (১৩২১)-এর মৃণাল সংসারের অবিচার অন্যায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষদের পরিচয়টা নিজে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছে । তবে তার

অভিযোগ যেভাবে বিমূর্ত সমাজ-সংসারের প্রতি, সেভাবে পুরুষের প্রতি নয়। স্বামীর বিরুদ্ধেতো নয়ই। স্বামীর সম্পর্কে বলছে, ''তোমার চরিত্রে এমন কোন দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি।''৪০ ভাসুর সম্পর্কেও তার অভিযোগ এমন নয় যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। সমাজের নির্মাতা বিধিবিধান সৃষ্টির কর্তা পুরুষকে সেভাবে অভিযুক্ত করতে পারে না। ''ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন।''৪১ সেই বেশি বুদ্ধির জোরেই মৃণাল আপাত এই সংসারজঞ্জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াস পায়। কিন্তু কোথায় সে যাবে ! সে এমন কোথাও যেতে পারে না। তার সেই যাওয়া প্রকৃত মুক্তির পথ দেখায় তেমন দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করছেন না। ধর্ম আর পুরুষের অত্যাচারে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা যেমন কাশি বৃন্দাবনে যেয়ে সমাজশৃঙ্খলকে আশ্বস্ত করে, মৃণালও তেমনি গেছে তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, পুরুষেরই সৃষ্টি জগদীশ্বর তার ভরসা। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন, ''যোগাযোগের কুমুদিনী ফিরে যায় রাক্ষসতুল্য স্বামীর গৃহে। 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালের কাজটাই যা ভিন্ন ধরণের। একান্নবর্তী পরিবারের দেয়াল ঘেরা চিহ্নিত চৌহদ্দিতে সে আর ক্ষয় করবে না নিজের জীবনকে। কিন্তু কোথায় যাবে মৃণাল ? আপাতত গেছে সে তীর্থে, থাকবে হয়তো কোন ধর্মাশ্রমে। সেওতো এক বন্দিনীরই জীবন।''৪২ তবুও মৃণাল রবীন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্রগুলোর মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রম। তীর্থের সংস্কারে নতুন করে জীবন আটকা পড়লেও সেই অর্গল সংসার থেকে বৃহৎ এবং ব্যাপ্ত। মৃণাল পত্রের শেষে মীরাবাঈ-এর গানের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, ''ছাড়ুক বাপ ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু ! তাতে তার যা হবার তাই হোক।''৪৩

সৌদামিনীর ভিতরও ভিন্নরকমের আভাস ছিল, সেই আভা প্রকাশে জোর নাই, বরং স্ববিরোধিতায় ভরা। *বদনাম* (১৯৪১) গল্পের সৌদামিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীরপত্র গল্প বলি। বিপিন পাল (স্ত্রীরপত্র গল্পের সমালোচনা লিখেছিলেন 'মৃণালের কথা' নামে) তার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পারবেন কেন ? তারপর আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধা পেলুম, ছাড়ব কেন, সুদূর (সৌদামিনী) মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।''৩৯ সুযোগ মতো বলিয়ে নেয়া যায়, বুদ্ধিমান আত্মসচেতন চরিত্র গড়ে ওঠে না তাতে। সৌদামিনীর স্বামী পুলিশের ইন্সপেক্টর। স্বভাবতই সে পুলিশ বৃটিশ সরকারের পুলিশ। আর এই ইন্সপেক্টর যে ডাকাত খুঁজছে সে আর কেউ নয় একজন বিপ্লবী। সে বিপ্লবী হলেও এবং পুলিশ তাকে ডাকাত বললেও জনসাধারণের কাছে অনিল অবতারের মতো। যত্রতত্র তার পূজা জোটে। সৌদামিনীও লুকিয়ে অনিলকে প্রশ্রয় দেয়। পূজা করে। আর স্বামীর জন্য রাত দুটা অব্দি খাবার আগলে বসে থাকে। স্বামী অনিলকে খুঁজছে আর সে গোপনে অনিলকে তথ্য দিচ্ছে, পূজা করছে তার এই পূজা ঠাকুরপূজা ভিন্ন কিছু নয়। যদিও সে জানে অনিল দেশের বিরল সুসন্তানদের একজন, এর বেশি নয়। অনিলকে পুলিশের কাছে, অর্থাৎ তার স্বামীর কাছে সৌদামিনীই ধরিয়ে দেয়, যেহেতু তা স্বামীর আজ্ঞা বা অনুরোধ ছিল। ইন্সপেক্টর বলল, ''এবারে একটা সরকারী কাজে তোমার সাহায্য চাই, নইলে আর মান থাকে না -।''৪৪ সৌদামিনীর উত্তর, ''শেষকালে আমাকেও তোমাদের চরের কাজে লাগাবে ! আচ্ছা তাই হবে। দু'দিনের মধ্যে সমস্ত রহস্য ভেদ হয়ে যাবে।''৪৪ হয়েছিলোও তাই। সেই ধরিয়ে দেওয়ার দৃশ্যটা বলার মতো, ''ভাঙ্গা দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটি মাটির প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে, দেখলেন (ইন্সপেক্টর) শিবলিঙ্গের সামনে তাঁর স্ত্রী জোড় হাত করে বসে, আর অনিল এক পাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।''৪৫

বার তের বছরের বালিকার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন ভিন্ন রকমের রূপ, সচরাচর যা দেখা যায় না, জমিদারী দেখভাল করতে নৌকায় অনেক ঘুরতে হতো, সেরকম কালে এক নদীর ঘাটে দেখতে পান ওই বালিকাকে, ''বোধ হয় বয়স বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ পনের দেখাচ্ছে। বেশ কালো অথচ বেশ দেকতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিস্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসংকোচে কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। --বাংলাদেশে যে এরকম ছাঁদের 'জনপদবধু' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করিনি।''৪৬ সেই জনপদবধূকে রবীন্দ্রনাথ হারিয়ে যেতে দেন নি। তাঁর নিজের মতো করে গল্পের নায়িকা করে তুললেন, নাম দিলেন, মৃন্ময়ী। *সমাপ্তি* (১৩০০) গল্পের এই পটভূমি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ছিন্নপত্রে। তবে ওই মৃন্ময়ীকে বিয়ে দিলেন কলকাতার বি.এ. পাশ অপূর্বকৃষ্ণর সঙ্গে। শ্রেণী বিচারে এই সম্বন্ধ খাপ খায় না। অপূর্বর মা রাজীও ছিলেন না, সে যাই হোক, ছেলের ইচ্ছা। এতো

আর মৃন্ময়ীর ইচ্ছা নয়, যে তা অগ্রাহ্য করাই কর্তব্য । মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সাথেই তার ভাব । গাছে চড়া, সাঁতার কাটা নানারকম অমেয়েলি স্বভাবের জন্য সবাই ওর ওপর বিরক্ত । সে যখন বি এ পাশ করা যুবকের বাসর ঘরে আটকা পড়ল, স্বভাবতই তার দম আটকে আসে, স্বামী লোকটিকে তার মোটেই পছন্দ হলো না, তার মন চঞ্চল হয়ে থাকে বন্ধু রাখালের জন্য । কিছুটা হতাশায় কিছুটা দরকারে কলকাতায় চলে যাওয়ার সময় অপূর্ব মৃন্ময়ীকে বলল, ''যতদিন না তুমি আসবার জন্য চিঠি লিখবে, আমি আসব না ।''[৪৭] এই অভিমানে মৃন্ময়ীর কিছু আসে যায় না, এমন কি তুমি ''ইচ্ছা করিয়া ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও''[৪৭] এই আব্দারও হেসে উড়িয়ে দিল । অপূর্ব কলিকাতা চলে যাওয়ার পর মার বাড়িতে মৃন্ময়ীর মনে প্রথম দোলা, এক অপূর্ব শিহরণে তার খুব ফাঁকা লাগে । বিধাতা কখন তাঁর সূক্ষ্ম তরবারি দিয়ে ''মৃন্ময়ীর বাল্য যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিল সে জানিতে পারে নাই । আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল । এখন শাশুড়িকেও মৃন্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়ীও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখা প্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখন্ডসম্মিলিত হইয়া গেল ।''[৪৮] অর্থাৎ সেই কাঙ্ক্ষিত নারীর আবির্ভাব ঘটল, সমাজ সংসারে যার ভূমিকা জীবপ্রকৃতির দ্বারা স্থির প্রতিষ্ঠ ! মৃন্ময়ী শরীরে যে চেতনা অনুভব করে তা স্বাভাবিক, কিন্তু সে সঙ্গে বুদ্ধিরও কি বয়স বাড়তে নাই ! শরীরের চেতনা ছাড়া ওই একই জৈবিক প্রবৃত্তি ছাড়া মৃন্ময়ীর ভিতর আর কোন বোধের সঞ্চার হতে পারে না ! মৃন্ময়ী কিন্তু নিরক্ষর নয়, সে লিখতে জানে পড়তে পারে, ওই তার সামান্য লিখতে জানা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ কিছু রস তৈরি করেন । মৃন্ময়ীর বাবা ঈশানচন্দ্র দূরে কুশীগঞ্জে একটা ছোট চাকুরি করে । মেয়েকে সে বহুবার চিঠি লিখেছে, মেয়ে চিঠির অপেক্ষাও করে । কিন্তু মেয়ে মৃন্ময়ী যখন চিঠি লেখে, তার ভাষা যাইহোক না কেন, সে কি জানবে না, 'লেফাফায়' নাম ঠিকানা লিখতে হয় ! মৃন্ময়ীর এই ঠিকানা লিখবার জ্ঞান থাকাটা কি খুব অস্বাভাবিক হতো ! যৌবনপ্রাপ্ত নারীর ওই একটিই কাম্য, কখন অন্ধকারে স্বামীর আলিঙ্গনে আটকা পড়বে এবং তার মাধ্যমে ঘটবে কৈশোর-কুমারীকালের সমাপ্তি, নারী জীবনেরও সমাপ্তি কি !

দ্বিতীয় শা-মামুদের আড়াইশত বৎসর প্রাচীন প্রাসাদের ঘরে ঘরে যে প্রেত-আত্মাদের বিলাপ আহাজারি, সেই প্রেতগুলোও নারী, বিলাপ আহাজারি অন্যকোন অত্যাচারের কারণে নয়, আরব ইরানী রমণী অতৃপ্ত কামনার জ্বালায় মরে যেয়েও পুড়ছে । *ক্ষুধিত পাষাণ* (১৩০২)-এর বৃদ্ধ করিম খাঁ জানাচ্ছে, ''--ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত, সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিস্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখন্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ (পুরুষ) পাইলে তাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায় ।''[৪৯] গয়নালোভী ভূত মণিমালিকাকে দেখেছি । নারী মরে যেয়েও অতৃপ্ত কামনার জ্বালায় কেমন ভয়ঙ্কর 'পিশাচী' হয়ে উঠতে পারে তার বর্ণনা পেলাম *ক্ষুধিত পাষাণ* গল্পে । *ক্ষুধিত পাষাণ*- এর ক্ষুধা রমণীর অতৃপ্তকাম ক্ষুধা । 'নারী পুরাতনী ।' আদিম জৈব-চেতনা বা ''মাংসের চেতনা থেকে বয়স্ক বুদ্ধিতে বেড়ে ওঠা''[৫০] র ফুরসৎ পেল না !

সূত্র নির্দেশ

১ রাজরানী, গল্প সল্প, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ ১৪০২, পৃ: ৪৮৬

২ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প* ডি.এম.লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ:৪২

৩ ঐ পৃ: ৪০

৪ ঐ পৃ: ২৭

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্ত্রীশিক্ষা, *বিচিত্রা* বাংলাদেশ সংস্করণ, অল্পকথা, ১৩৯৯, পৃ: ২২৩

৬ ঐ পৃ: ২২৪

৭ ফরহাদ মজহার, *এবাদতনামা* প্রতিপক্ষ, ঢাকা, ১৩৯৬, : ১৫

৮ 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ ১৮১৮' *রামমোহন রচনাবলী* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ: ২০২

৯ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার ১৮৭১' *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনাবলী* তুলি-কলম, কলকাতা ১৯৮৭, পৃ: ৮৪৩

১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পুনরাবৃত্তি' *লিপিকা* ত্রয়োদশ খন্ড বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ ১৪০২, পৃ: ৩৫৮

১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘খাতা’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ পৃ: ১৮২
১২ ঐ পৃ: ১৮৪
১৩ ঐ পৃ: ১৮৫
১৪ ‘পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি’ *রবীন্দ্র-রচনাবলী* দশম খন্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ পৃ: ৪৫০
১৫ ঐ পৃ: ৪৫৩
১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শাস্তি’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ১৫৪
১৭ ঐ পৃ: ১৫৭
১৮ ঐ পৃ: ১৬০
১৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ঘাটের কথা’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৪
২০ ঐ পৃ: ৭
২১ ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার ১৮৭১’ *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনাবলী* তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ: ৮৩৪
২২ ‘রানী ভিখারিনী’ *বেগম রোকেয়া রচনাবলী* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ:২৯১
২৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘প্রতিবেশিনী’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৩৮১
২৪ ‘পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি’ *রবীন্দ্র-রচনাবলী* দশম খন্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ পৃ: ৪৫৫
২৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘মণিহারা’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৩৩৫
২৬ ঐ পৃ: ৩৩৯
২৭ ঐ পৃ: ৩৪৩
২৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সংস্কার’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৬৪৭
২৯ ঐ পৃ: ৬৪৮
৩০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘পাত্র পাত্রী’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৬২৭
৩১ ঐ পৃ: ৬৩১
৩২ ঐ পৃ: ৬৩৩
৩৩ ‘নারী’ কালান্তর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* , দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ পৃ: ৬২২
৩৪ ঐ পৃ: ৬২৩
৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ছোটগল্প’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৭৫১
৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ল্যাবরেটরি’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৬৯৭
৩৭ ঐ পৃ: ৭০২
৩৮ ঐ পৃ: ৭০৩
৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘গ্রন্থ পরিচয়’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৮৬৫
৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘স্ত্রীর পত্র’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৫৭৫
৪১ ঐ পৃ: ৫৬৮
৪২ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ‘বাঙালির সংস্কৃতিতে নারী’ *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা* ২য় সংখ্যা, পৌষ ১৪০৫, পৃ: ১৮
৪৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘স্ত্রীর পত্র’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৫৭৬
৪৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বদনাম’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৭৩১
৪৫ ঐ পৃ: ৭৩২
৪৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘গ্রন্থ পরিচয়’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ৮৫৮
৪৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সমাপ্তি’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ১৭২
৪৮ ঐ পৃ: ১৭৩
৪৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সমাপ্তি’ *গল্পগুচ্ছ* বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ: ২৭৮
৫০ ফরহাদ মজহার, *এবাদতনামা* প্রতিপক্ষ, ঢাকা, ১৩৯৬, : ৮

আরো পড়ুনঃ

- রবীন্দ্রনাথের চোখে নারী : ডঃ হুমায়ুন আজাদ